ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন: গণতান্ত্রিক সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয়*

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

একটি দেশে গণতান্ত্রিক শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম, যে শাসনব্যবস্থার মূলে আবশ্যক শর্ত এই যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এবং অন্যদের সাথে তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হবে[১]। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দমাফিক প্রতিনিধি বাছাই করে নেবার সুযোগ লাভ করে থাকেন। “আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব” এই স্লোগানের মধ্যে দিয়ে এই প্রত্যয়ই প্রতিফলিত হয়েছে যে জনগণ তাদের ভোটাধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে পছন্দের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবেন। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা যদি বিগত দিনগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই সাম্প্রতিক অতীতে ২০০৮ সালে একটি গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে সকল মহলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছিল। সমগ্র বাংলাদেশের জনগণ সেসময় এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন যে উক্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে তারা তাদের পছন্দমত প্রকৃত প্রতিনিধিদেরকেই সংসদে প্রেরণ করতে পেরেছেন। তারা আশাবাদী হয়ে ওঠেন যে ভবিষ্যতে একইভাবে তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবেন। কিন্তু সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের প্রক্ষিতে ২০১৩ সালে তৎকালীন প্রধান বিরোধীদলের নেতৃত্বাধীন জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের পথ বেছে নেয় এবং রাজপথে অনড় থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে, ফলে নির্বাচন হয়ে পড়ে একদলীয়। এতে করে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের উৎসাহ উদ্দীপনা যেমন একদিকে কমে যায়, অপরদিকে নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতাসীন হন তারা জাতীয় নীতি নির্ধারণ এবং শাসন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এক ধরনের একক দলীয় আধিপত্যের সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিরোধীদলসমূহ সম্মিলিত জোটবদ্ধভাবে ফিরে এলেও কাঙ্ক্ষিত সফলতা দেখাতে পারেননি, যার জন্য দায়ী অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ‘সবার জন্য সমান ক্ষেত্র’ (Level Playing Field) -এর অনুপস্থিতি, যার মধ্যে ইসি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিতর্কিত ভূমিকা রয়েছে। নির্বাচনী প্রচারাভিযান পর্যায়ে বিরোধী দলের ওপর দমন-পীড়ন, নির্বাচনকালে বুথে প্রতিনিধি প্রেরণ ও অবস্থানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি, এবং রাতের অন্ধকারে অবৈধ ভোট প্রদানের মত গুরুতর অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। ফলে এই নির্বাচনে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতটুকু সফল হয়েছেন সে বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে গেছে। অপরদিকে ২০১৩-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমাগত দুর্বল হয়েছে এবং আজ অবধি বিরোধী শিবির এমন কোনো গণভিত্তি ও সাংগঠনিক দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেননি যার দ্বারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নির্বাচন অনুষ্ঠান সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করবার ক্ষেত্রে তারা কার্যকর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আমাদের সামনে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এই নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য এবং সর্বোপরি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনে পরিণত করাই বর্তমানে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সুশাসন অব্যাহত রাখবার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনেরই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে প্রদত্ত সাংবিধানিক বিশেষ দায়িত্ব ছাড়াও নির্বাচনকালীন সরকার ও তার প্রশাসনিক যন্ত্র, বিশেষত প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাতারী সংস্থাসমূহ, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একাদশ সংসদের নেতা নিজেই এ বিষয়ে তার দল ও সরকারের ইচ্ছার কথা অতি সম্প্রতি খুবই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। সংসদে এক প্রশ্নোত্তরে তিনি ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক করে তুলবার ক্ষেত্রে তার সরকারের গৃহীত ১১টি পদক্ষেপের উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে ছবি সংবলিত ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। সংবিধানের ১১৮ (৪) অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে জোর

---

* ২০২২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আয়োজিত সেমিনারের কার্যপত্র। মোহাম্মদ রফিকুল হাসান টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক।

[১] Democratic governance | OSCE

দিয়ে বলেন যে নির্বাচন কমিশন তার কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাধীন থাকবে এবং এর (অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন তথা ইসির) কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা সরকার ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। তার দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে আন্তরিক ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংসদে পেশকৃত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সকল আশা উদ্দীপক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে আমরা আশা করব নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচনের সময়ে নির্বাচন-প্রত্যাশী সকল রাজনৈতিক দলের জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করাসহ ভোটারের ভোটকেন্দ্রে আগমন ও ভোট প্রদানের সুযোগ করে দেবার বিষয়টির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবেন। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা, স্বচ্ছ ভোটবাক্স বা ইভিএমের ব্যবহারসহ সবকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি সকল রাজনৈতিক দলের জন্যে সুষ্ঠু, অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ না থাকে এবং ভোটার ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখতে পান তার ভোটটি পূর্বেই দেওয়া হয়ে গেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোটারদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ভোটকেন্দ্রে সকল দলের প্রতিনিধির উপস্থিতির সুযোগ নিশ্চিত করা হয়নি এবং ভোট গণনার সময় তাদের উপস্থিতিও নিশ্চিত করা হয়নি। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় এই অভিযোগসমূহ ব্যাপকভাবে উত্থাপিত হয়েছে, গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্তও এসব অভিযোগের স্বপক্ষে ছিল এবং এখনো এগুলো নির্বাচন-কেন্দ্রিক উদ্বেগের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিরাজ করছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি। সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধিও এরকম হওয়া প্রয়োজন যাতে সকল দলের জন্যে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত হয়।ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দশম এবং একাদশ উভয় সংসদ নির্বাচনের সময়ই অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছে যে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একজন সংসদ সদস্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নতুন সংসদ সদস্য পদের জন্যে নির্বাচনে পক্ষপাত বা প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ও ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ আমরা দেখতে পাই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যেখানে বিতর্কিতভাবে কয়েকটি কেন্দ্রের ফলাফল দেরিতে ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন মেয়রকেই নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে সমতার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পঞ্চদশ সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট ধারা বাতিল করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে হবে। এই সমতাব্যঞ্জক অবস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নির্বাচন কমিশনের শতভাগ নিরপেক্ষ অবস্থান নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে আইনি সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারের কার্যক্রম সীমিত রুটিন কাজে সীমাবদ্ধ করা।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে একটি নির্বাচনকে কার্যকরভাবে সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শুধু নির্বাচনের দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নির্বাচনী আচরণ বিধিসমূহ বিশেষত সরকারি দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচারাভিযান নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা অনুযায়ী মেনে চলার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। মনোনয়নের ক্ষেত্রে তৃণমূলের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে হবে এবং মনোনয়ন বাণিজ্যের অবসান হতে হবে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমনকি বিদেশে বসেও কোটি কোটি টাকার মনোনয়ন বাণিজ্য পরিচালনার অভিযোগ এসেছে। টাকার বিনিময়ে যদি প্রার্থী মনোনয়ন লাভ করে তাহলে সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি অপ্রধান হয়ে ওঠার ঝুঁকি সৃষ্টি হয় এবং যারা প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা গোড়াতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া নির্বাচনী প্রচার প্রক্রিয়ায় ব্যয় বিধিবদ্ধ সীমার মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যত্যয়ের অভিযোগ রয়েছে। মনোনয়ন এবং প্রচারে বিপুল অর্থ ব্যয় করে যারা নির্বাচিত হন তারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব কমই করতে পারেন। ফলে ‘প্রতিনিধিরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব না করে নিজেদেরই প্রতিনিধিত্ব’ শুরু করেন এরকম একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

তাই নির্বাচনকে অর্থবহ ও জনগণের প্রতিনিধিত্বশীলতার ক্ষেত্রে কার্যকর হতে হলে নির্বাচনী মনোনয়নকে দুর্নীতিমুক্ত করে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনে যে বিধান সৃষ্টি করেছিল নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সেটি পুনরায় চালু করার দাবি রয়েছে। জনগণ নির্বাচনের দিন ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পান বটে কিন্তু পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা আর জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকার ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়েন না। ফলে পাঁচবছর মেয়াদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করছেন কিনা তা পরিবীক্ষণ করবার কোন সুযোগ ভোটাররা আর পান না। পৃথিবীর অনেক দেশে এক্ষেত্রে দুই সংসদ নির্বাচনের অন্তর্বর্তিকালীন পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রত্যাহারের সুযোগ আছে (Recall method)। সংসদকে জনপ্রিতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ভোটারদের অনুরূপ আইনগত সুযোগ সৃষ্টির সুপারিশ টিআইবি পূর্ব থেকেই করে আসছে। জনগণকে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে প্রতি পাঁচ বছরে একবার ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করবার জন্যে নির্বাচনের প্রচলিত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও টিআইবি ইতিপূর্বে আলোচনায় এনেছে। বর্তমান পদ্ধতিতে মোট ভোটের কম শতাংশ পেয়েও আসনভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠনের সুযোগ রয়েছে এবং দৃষ্টান্তও রয়েছে, যা ‘বিজয়ীরাই সবকিছু পাবে’ (Winners take it all) এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কারণ। এর ফলে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে

বিরোধী দলগুলির মধ্যে আপোষহীন সহিংস লড়াইয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি হয় । ‘আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি’ (Proportional Representation Method) প্রবর্তনের মাধ্যমে এ ধরনের সহিংসতার ঝুঁকি কমিয়ে আনা যেতে পারে ।

নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করবার জন্যে সর্বাধিক গুরু-দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন । তবে দায়িত্ব নেবার পর থেকে নতুন কমিশন সকল দলকে নির্বাচনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছেন । টিআইবি এ ব্যাপারে শুরু থেকেই তার বক্তব্য স্পষ্টভাবে জানিয়েছে । টিআইবি মনে করে যদি সকল দলের আস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে নির্বাচনে নিয়ে আসার জন্যে আইনগত পরিবর্তন/সংস্কার প্রয়োজন হয় তাহলে নির্বাচন কমিশনকে সেকথা স্পষ্টভাবে সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে । বিদ্যমান আইনি কাঠামোর বিভিন্ন ঘাটতি, যা নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করবার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা সৃষ্টিতে বাধা দেয়, সেগুলো দূর করবার জন্যে সরকারের কাছে সুপারিশ করা নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে । দুঃখজনক যে এ ধরনের কোন উদ্যোগ না নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা সকল দলের আস্থা সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত ।[১] একইভাবে ইভিএম সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে । ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে যে ভোটগ্রহণের জন্যে এবার সর্বোচ্চ ১৫০টি আসনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে । তবে এই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে এবং অনেকেই এটিকে নতুন নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুতর নেতিবাচক একটি পদক্ষেপ বলে মনে করছেন । নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেবার পর রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন । এই মতবিনিময়কালে বেশিরভাগ রাজনৈতিক সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ইভিএম ব্যবহারের বিপক্ষে মত দেন । যারা মতবিনিময়ে যোগ দেননি তারাও গণমাধ্যমে বিবৃতি বা তাদের বক্তব্যে ইভিএম ব্যবহারের বিষয়ে তাদের অনাস্থা ব্যক্ত করেছেন । এই পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি মনে করে ইসির এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিতর্কিত এবং তা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক ও স্বাধীন নির্বাচনী ভাষ্যকার, এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞসহ প্রাসঙ্গিক অংশীজনদের উদ্বেগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে । ইসি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ ও যুক্তিসমূহ পর্যাপ্তভাবে কোথাও ব্যাখ্যা করেনি, তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে এটি কি একটি পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত ছিল? টিআইবি আরও মনে করে ইভিএম ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপকসংখ্যক অংশীজনের বিরোধিতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবং বর্তমান আর্থিক সংকটের প্রেক্ষিতে ইসির উচিত ইভিএম ব্যবহারের রাজনৈতিক, আর্থিক এবং কারিগরি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করে সেগুলো স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরা । অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইভিএম ব্যবহারের এই সিদ্ধান্ত কতটুকু সুনির্দিষ্ট অবদান সত্যি সত্যি রাখবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সেগুলো কী কী সে সম্পর্কে জানার অধিকার দেশের ভোটারদের রয়েছে ।

অপরদিকে এখনো পর্যন্ত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই নির্বাচন প্রসঙ্গে বর্জনের কথাই উচ্চারিত হচ্ছে । মনে রাখতে হবে, তাদের আপত্তি শুধু ইভিএম-কেন্দ্রিক নয় । সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, এবং সেই লক্ষ্যে নির্বাচনকালীন সরকার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহ এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হলে আশা করা যায় যে ২০১৩ এর মত অনমনীয় পদক্ষেপ তারা নেবেন না এবং নির্বাচন বর্জনের চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী হবেন । নির্বাচন যেন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় সেজন্যে তারা প্রয়োজনীয় বাস্তবায়নযোগ্য দাবিসমূহ পেশ করবেন । সরকারের পতন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে যদি তারা আন্দোলনে অনড় থাকেন তাহলে রাজনৈতিক সংকট ঘণীভূত হবারই সম্ভাবনা থেকে যাবে বলে আশংকা করার যথেষ্ট বাস্তবসম্মত কারণ রয়েছে । প্রকৃতপক্ষে সরকারি দল এবং বিরোধী দল উভয়পক্ষকেই দেশ এবং জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা এবং ছাড়ের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আসা প্রয়োজন, যেখানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষই আশাবাদী হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ দেখতে পাবেন । এ ধরনের একটি অবস্থান, যেখানে উভয় পক্ষই নির্বাচনে অবাধ অংশগ্রহণ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠতে পারেন তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক সরকারি ও বিরোধী দল, নির্বাচন কমিশন, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজনের জন্যে গ্রহণযোগ্য কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ বিভিন্ন সময়ে টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ভিত্তিতে এখানে তুলে ধরা হলো ।

১. রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সকল রাজনৈতিক দলকেই শান্তিপূর্ণ পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে নির্বাচনকে কার্যকর করে তোলার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও আন্তরিক হতে হবে ।

---

[১] সম্প্রতি একজন নির্বাচন কমিশনার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে সকল দলকে নির্বাচনে নিয়ে আসা নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়। সূত্রঃ The Daily Star Online, Friday August 26, 2022, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news/not-ecs-job-make-all-parties-join-polls-3103256; প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, “নির্বাচন কমিশন (ইসি) সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক ভোট চায়। তবে কাউকে ধরে-বেঁধে নির্বাচনে আনবে না ইসি।” সূত্র: প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, ইসি কাউকে ধরে–বেঁধে ভোটে আনবে না: সিইসি | প্রথম আলো (prothomalo.com)

- সরকারি দল অন্যান্য সকল দলের আস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, যার মধ্যে রয়েছে সকল দলের সাথে কার্যকর সংলাপ, সরকারের পক্ষ হেকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের দাবিসমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, এবং নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা নিশ্চিত করা ।
- বিরোধী দলের/ জোটের পক্ষ থেকে কোনো অনড় অবস্থানে যাওয়ার পরিবর্তে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য জাতির সামনে বাস্তবায়নযোগ্য দাবি পেশ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনায় বসতে হবে ।

২. আইনি সংস্কার

সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহায়ক প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করতে হবে । **বিশেষত ক্ষমতাসীন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণ পদত্যাগ না করেই নির্বাচনে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করলে অন্যান্য প্রার্থীদের সাথে তাদের প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বিধায় এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে** । এছাড়াও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবেঃ

- নির্বাচনকালীন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা;
- নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী তিনমাস পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে) কমিশনের অধীনে রাখা;
- তৃণমূল থেকে মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলক করা;
- আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত শাস্তির ক্ষেত্রে আইনে সব ধরনের অসামঞ্জস্যতা দূর করা (যেমন এখনো গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আইন ১৯৭২ এবং নির্বাচনী আচরণ বিধিমালায় একই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান লক্ষ করা যায়); এবং কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব ছাড়া নির্বাচনী আইন বাস্তবায়ন;
- রাজনৈতিক দলের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা;
- প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই করার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারা নির্বাচনী আইনে অন্তর্ভুক্ত করা;
- জাতীয় নির্বাচনকে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে নির্বাচনে নারী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রযোজ্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা । বর্তমানে কোনো আইনেই তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি ।

৩. ইভিএম ব্যবহার

১৫০টি পর্যন্ত আসনে ইভিএম ব্যবহারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করতে হবে এবং এ বিষয়ে পুনরায় কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে ইভিএম ব্যবহারের রাজনৈতিক, আর্থিক এবং কারিগরি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করে ইভিএম ব্যবহারের ফলে সম্ভাব্য প্রাপ্তি ও ঝুঁকির বিষয়গুলো দেশবাসীর সামনে স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরতে হবে ।

৪. নির্বাচনকালীন ও নির্বাচনোত্তর বিভিন্ন পদক্ষেপ:

- প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ঘটনা নির্বাচন কমিশনকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং আইন ও বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ নিতে হবে । প্রয়োজনে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে প্রার্থী ও দল-নির্বিশেষে নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতাও প্রয়োগ করার মতো দৃঢ়তা দেখাতে হবে ।
- সব দলের সভা-সমাবেশ করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের দমন-পীড়ন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ইসি কর্তৃক কঠোরভাবে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা;
- সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ এবং সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে;
- ভোটকেন্দ্র/বুথে অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ/প্রভাব বিস্তার/বলপ্রয়োগ /সংঘর্ষ এবং জাল ভোট প্রদান রোধে সবগুলো নির্বাচন কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন এবং ভোটদানকালীন সময়ে এগুলো চালু থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে ।
- সুস্থ, নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আগ্রহী সকল দেশি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অবাধ ও সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে । এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যথাযোগ্য সংস্কার করতে হবে ।

- নির্বাচন পর্যবেক্ষক, গবেষক ও গণ-মাধ্যমের তথ্য সংগ্রহের জন্য অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সংবাদ-মাধ্যমের জন্য কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না, যেমন নির্বাচনের সময়ে ইন্টারনেটের গতি হ্রাস করা, মোবাইল ফোনের জন্য ফোর-জি ও থ্রি-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখা, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোটরচালিত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি।
- ভোটকেন্দ্র/বুথে অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ/প্রভাব বিস্তার/বলপ্রয়োগ /সংঘর্ষ এবং জাল ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী ট্রাইবুনালে অভিযোগ দায়ের করতে উৎসাহিত করতে হবে।
- নির্বাচনী ট্রাইবুনালের অধীনে অভিযোগ দায়ের করার পরবর্তী ছয়মাসের মধ্যে আপিলসহ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
- প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ব্যয়সহ অন্যান্য তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. অন্যান্য

- অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে প্রচারণা চালাতে উৎসাহিত করতে হবে ।
- সংবাদ-মাধ্যমে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ওপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।
- নাগরিক সমাজ ও নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞ সংস্থাকে প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।
- প্রার্থী এবং ভোটারদের নির্বাচনী আচরণ বিধি ও তা লঙ্ঘনজনিত শাস্তি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে উদ্যোগ নিতে হবে।
- দীর্ঘ মেয়াদে নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে ।

মাত্র গতকালই নির্বাচন কমিশন আগামী সংসদ নির্বাচনকে "অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক" করার ক্ষেত্রে ১৪টি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তাদের করণীয় বিষয়ে একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন[৩]। এ উপলক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে খোলাখুলি স্বীকার করা হয়েছে যে ইসি অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন এবং আস্থাশীলতার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক করতে তারা যে সকল চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছেন তা এই প্রবন্ধে আলোচিত চ্যালেঞ্জগুলো হতে ভিন্নতর কিছু নয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বেই এসকল চ্যালেঞ্জ উত্তরণে ইসি কতটুকু সফলতা লাভ করেন সেটাই মূল বিষয়। টিআইবি মনে করে ইসির এই চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ সময়োপযোগী, তবে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সকল অংশীজন, বিশেষত সরকারের রয়েছে গুরত্বপূর্ণ নির্ণায়ক ভূমিকা।

যে উপলক্ষে এই সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করা হয়েছে, সেই আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবসের অন্যতম প্রতিপাদ্য হল গণতান্ত্রিক নীতিসমূহকে উর্ধ্বে তুলে ধরা। অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হল সেই গণতান্ত্রিক মূলনীতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরবার একটি অন্যতম উপকরণ। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন এই ধরনের একটি নির্বাচন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে যাচ্ছে, যা নিশ্চিত করবার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সুশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে প্রত্যেক অংশীজনকে জাতীয় নির্বাচন কাংখিতভাবে অনুষ্ঠিত করে দেশে গণতান্ত্রিক সুশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

সহায়ক তথ্যসূত্র ও গবেষণা প্রতিবেদন

Transparency International Bangladesh, 'Bangladesh Election Commission: A Diagnostic Study', 2006.

টিআইবি, ‘নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা: স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের ওপর একটি বিশ্লেষণ’, ২০০৭।

টিআইবি, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, ২০০৮।

টিআইবি, *জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা*, ২০১০।

টিআইবি, *নবম সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা*, ২০১০।

---

[৩] আমরা অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন: ইসি | প্রথম আলো (prothomalo.com)

টিআইবি, *নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা*, ২০১২।

টিআইবি, ‘বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা: প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাবনা’, ২০১৩।

টিআইবি, ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি’, ২০১৪।

টিআইবি, ‘জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ’, ২০১৪।

টিআইবি, *কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*, ২০১৪।

টিআইবি, ‘ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ’, ২০১৫।

টিআইবি, ‘রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার’, ২০১৮।

টিআইবি, ‘একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা’, ২০১৯।

---

[i] প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশনা দিয়েছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং উপদেষ্টা-নির্বাহী পরিচালনা ড. সুমাইয়া খায়ের। এছাড়া প্রবন্ধটির সম্পাদকীয় পাঠ ও এর ওপর মতামত দিয়ে একে ঋদ্ধ করেছেন টিআইবির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম. আকরাম। তাদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। লেখাটি খুবই স্বল্প সময়ের পরিসরে প্রস্তুতকৃত, এটি কোন গবেষণা উপস্থাপনা নয়, এটি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনাকে উসকে দেবার জন্যে একটি কীনোটপত্র (Keynote Paper)-এর মত এবং এর সকল ভুলত্রুটি সীমাবদ্ধতার জন্যে লেখক নিজেই দায়ী।